

রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন

রাষ্ট্র হচ্ছে সামাজিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে বসবাসরত সকল মানুষকে একটি ঐক্য সূত্রে বাঁধা এবং তাদের কল্যাণ ও সমস্যা সমাধানের জন্যই রাষ্ট্রের অবির্ভাব ঘটে। সমাজ বিকাশের একটি স্তরে সমাজের মধ্য থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাষ্ট্রকে মনে করা হতো ঈশ্বরের সৃষ্টি করা একটি প্রতিষ্ঠান। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে 'সর্বজনীন কল্যাণ সাধনকারী' এবং 'মানুষের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য' প্রতিষ্ঠান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্র হলো নাগরিকদের জন্য। নাগরিকের সুখ ও শান্তি বিধান করার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক কাজ করতে হয়। রাষ্ট্রের এই কাজ কতগুলো অপরিহার্য এবং কতগুলো ঐচ্ছিক। আবার রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদেরও বেশ কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে হয়। অন্যদিকে নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলো প্রতিরোধ ও প্রতিকারে আইনের বিধিবিধান আবশ্যিক। এ অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্র, নাগরিক ও আইন সম্বন্ধে অবহিত হব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাষ্ট্রের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নাগরিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হব;
- আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- আইনের উৎস ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

রাষ্ট্রের ধারণা

প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। হঠাৎ করে কোনো রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি। আদিম মানুষ প্রথমে গোত্রভিত্তিক বসবাস করত। সময়ের পরিবর্তনে একসময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। মানুষই রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। নাগরিকদের সুন্দর সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্য রাষ্ট্র অনেক কাজ করে থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক তত্ত্ববিদরা রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, 'স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর. এম. ম্যাকাইভারের মতে, 'রাষ্ট্র হচ্ছে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন, যার কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা রয়েছে এবং যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত অধিবাসীদের ওপর বলবৎ হয়।' অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র হলো বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক জনসমাজ, যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বাহির্শক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে, যে সরকারের প্রতি ঐ জনসমাজ স্বাভাবিকই অনুগত।'।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি, রাষ্ট্র হলো একটি ভূখণ্ডভিত্তিক সমাজ বিশেষ, যার সংগঠিত সরকার ও জনসমষ্টি রয়েছে এবং যার নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করলে আমরা রাষ্ট্রের চারটি উপাদান দেখতে পাই, যথা: জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। প্রত্যেক রাষ্ট্রই এ চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

জনসমষ্টি : রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে জনসমষ্টি। জনসমষ্টি বলতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনগণকে বোঝায়। রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসমষ্টি একান্ত অপরিহার্য। জনসমষ্টির এক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে রাষ্ট্র ধারণার উদ্ভব হয়েছে। তবে রাষ্ট্র গঠনের জন্য জনসংখ্যা কত হবে তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কয়েক কোটি হতে পারে। আবার কয়েক হাজারও হতে পারে। গণচীন ও ভারতে জনসংখ্যা একশ কোটির উপরে। অন্যদিকে স্যানম্যারিনো ও মোনাকো এ দুটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৩৩,৭৩৩ ও ৩৮,৯৫৬ (২০২৩ সালে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রতিবেদন অনুযায়ী)।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড : নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের অপরিহার্য দ্বিতীয় উপাদান। প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভূখণ্ড বলতে স্থলভাগ, সমুদ্রসীমা, আকাশসীমাও বোঝায়। রাষ্ট্রের জনগণের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক। জনসমষ্টি এক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে অথবা সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিটি রাষ্ট্রই ভূখণ্ডের সীমানাকেন্দ্রিক নিরাপত্তা বেকনি গড়ে তোলে। ভূখণ্ড বড়ো বা ছোট হতে পারে, যেমন- রাশিয়ার আয়তন অনেক বড় আর ছোট আয়তনের রাষ্ট্র হলো- দারুস সালাম, সুইজারল্যান্ড, ব্রুনাই ইত্যাদি। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভূখণ্ডটি পৃথিবীর মানচিত্রে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থান পায়। অনেক সময় রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বেশ কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টিও হতে পারে, যেমন- জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি।

ফাজ

একক : বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি এবং কেন?

সরকার : রাষ্ট্রের অপরিহার্য তৃতীয় উপাদানটি হলো সরকার। সরকার গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ থাকে- আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। এ তিন বিভাগের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের সরকার গঠন করে। সরকার পদ্ধতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন হতে পারে। সরকার বলতে ব্যাপক অর্থে শাসকগোষ্ঠীর সকলকে বোঝায়, যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। অধ্যাপক গার্নারের মতে, ‘রাষ্ট্র যদি হয় জীবদেহ তবে সরকার হলো এর মস্তিষ্কস্বরূপ’।

সার্বভৌমত্ব : রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান সার্বভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐ বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসম্মতভাবে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকর করার জন্যে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবে। আর এ ক্ষমতাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের আদেশই হলো আইন। সার্বভৌমের আদর্শ বা আইন মানতে সকলেই বাধ্য। সার্বভৌম ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটি দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের মধ্যকার সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এই সার্বভৌম

ক্ষমতার উর্ধ্বে কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহির্শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না। যতদিন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিদ্যমান থাকে ততদিন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্ব থাকবে। সরকারের পরিবর্তন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্বকে নষ্ট করে না।

সুতরাং, জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব এ চারটি উপাদান নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়। এর যে কোনো একটি উপাদান না হলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র কী কাজ করে কিংবা রাষ্ট্র কী করতে পারে, আমাদের জানা দরকার। অর্থাৎ জনগণের জন্য রাষ্ট্র কী ধরনের সেবা প্রদান করে এবং এর সামর্থ্য কতটুকু এ পাঠ থেকে আমরা তা জানব। মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের কাজ। বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে, যথা: নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কল্যাণমূলক। এ দুই ধরনের ভূমিকার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন-অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি এবং কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি : রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো নিম্নরূপ:

আর. এম. ম্যাকাইভার তাঁর *The Modern State* গ্রন্থে বলেছেন, ‘আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ বা দায়িত্ব। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।’ এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। বাংলাদেশে পুলিশ, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ইত্যাদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে।

জাতীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা রাষ্ট্রের আরেকটি অপরিহার্য কাজ। দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। আধুনিককালে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামর্থ্য ও আধুনিকায়ন একটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে, যেমন-আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব প্রদানে তাদের দেশরক্ষা বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গানে রাষ্ট্রকে পরিচিত করা, রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত সম্পদের ওপর দাবি প্রতিষ্ঠিত করা, অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন, আঞ্চলিক কোর্ট গঠন, বহির্বিশ্বে অর্থনৈতিক বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করা, বিদেশে অবস্থানরত দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সেবা প্রদান করা ইত্যাদি হচ্ছে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক অপরিহার্য কাজ।

আইন প্রণয়ন, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ। রাষ্ট্রীয় আইনসভা বা পার্লামেন্টের মাধ্যমে আইন প্রণীত হয়। দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট প্রভৃতি বিচারালয়ের মাধ্যমে দেশের সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজের মধ্যে পড়ে।

রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। এ কাঠামোয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, তাদের কর্মবন্টন ও নির্দেশ, কাজ তদারক এবং পরিচালনা করা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।

অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থ সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের একটি মুখ্য কাজ। রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে এ অর্থ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজ। রাষ্ট্রের অধীন বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মালিকানার ওপর খাজনা ও কর নির্ধারণ এবং তা আদায় করা ও সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। রাষ্ট্র বাজেট প্রণয়ন, মুদ্রা প্রবর্তন ও মুদ্রা বিনিয়োগের ব্যবস্থা, গণনা ও পরিমাপের একক নির্ধারণ এবং মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রভৃতিও রাষ্ট্রের মুখ্য কার্যাবলি।

কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি : বর্তমানে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের দাবি করে। রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা এখন একমত যে, রাষ্ট্রের ভূমিকা শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং কর আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রকে অবশ্যই সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য, নাগরিকদের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে কল্যাণমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। জনকল্যাণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের এ কাজগুলো ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ। যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে যত বেশি উন্নত তার ঐচ্ছিক কার্যাবলি তত বেশি বিস্তৃত।

কাজ
দলপত : রাষ্ট্রের কার্যাবলির একটি ছক তৈরি কর।

রাষ্ট্রের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং দেশপ্রেমে উদ্ভূত হন। এজন্য রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিক্ষা সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে, নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং বিদ্যমান বিভিন্ন বৈষম্য ও কুপ্রথা দূরীকরণে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুসদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, দেশব্যাপী অস্থায়ী হেল্প ক্যাম্পেইন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিও পরিচালনা করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশুদ্ধ পানীয়জলের সুব্যবস্থা, পরঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান প্রভৃতি সেবাও রাষ্ট্র প্রদান করে। এছাড়া যৌতুক ও বর্ণ বা গোত্রপ্রথা দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ এবং জেভার সমতা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য, যেমন-চাল, ডাল, আটা, ময়দা, চিনি, তেল ইত্যাদি সরবরাহ প্রক্রিয়া সচল রাখা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তদুপরি খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ, সেচের ব্যবস্থা করা, খাদ্য গুদামজাতকরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে স্বীকৃত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। তাই রাষ্ট্রকে খাদ্যনিরাপত্তায় পূর্বের তুলনায় অধিক মনোযোগ দিতে হচ্ছে।

যে কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি তার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্র নিত্যনতুন শিল্প গড়ে তোলা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও ঋণ প্রদান, শিল্পজোন প্রতিষ্ঠা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করা রাষ্ট্রের কাজ। আমদানি নির্ভর না হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন যে কোনো রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক বেশি নজর দিতে হয়। এছাড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কলকারখানা স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ।

দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যথা: রাস্তাঘাট, সেতু, সড়ক, রেলপথ, নৌ-চলাচল, বিমান যোগাযোগ ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ এবং যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত থাকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ। বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং ও তরঙ্গের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিশ্বে পারস্পরিক যোগাযোগ অনেক বেড়ে গেছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সুষ্ঠু পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য অপরিহার্য।

জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য ভুলে ধরা রাষ্ট্রের কাজ। জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে দেশীয় শিল্প, গান-বাজনা, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য রক্ষা, লোকশিল্পের সংরক্ষণ, জাদুঘর প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ। জনগণের চিন্তাবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় মঞ্চ, খেলার মাঠ, পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো জনগণের স্বাধীনতা এবং অধিকার রক্ষা করা। রাষ্ট্র জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাষ্ট্র অবাধ ও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করে। এছাড়া জনগণের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পরিবেশ সৃষ্টি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা, জনগণের বিপরীতমুখী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সমাজে দুর্নীতি প্রতিরোধ, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয় দান ইত্যাদি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক রাজনৈতিক কাজ।

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাষ্ট্র বসবাসরত দরিদ্র, বিধবা, অনাধ ও প্রতিকল্পী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা, বেকারদের জন্য ভাতা, বয়স্কদের জন্য বয়স্ক ভাতা, পেনশন প্রদান ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কার্যাবলি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের বিশাল কর্মীবাহিনীকে পরিচালনা করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমনীতিমালা প্রণয়ন, ন্যূনতম সঠিক মজুরি ও কাজের সময় নির্ধারণ, কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, বোনাস, ইন্স্যুরেন্স, পেনশন

সুবিধা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরি, কর্মরত বিদেশি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রম অফিসার নিয়োগ প্রভৃতি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এছাড়া রাষ্ট্র বিবিধ উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজ সম্পাদন করে থাকে, যেমন- কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বনায়ন কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধ, নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি, বিদ্যুতায়ন ও জ্বালানি সরবরাহ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থ ব্যবস্থাপনা, নগরায়ণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, কালোবাজারি রোধ, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বহুবিধ কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করে।

রাষ্ট্র একটি বৃহদাকার সংগঠন। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ রাষ্ট্রকে মোকাবিলা করতে হয়। তবে সার্বিকভাবে জনগণের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজের পরিধি দিনদিন ব্যাপক ও বিস্তৃত হচ্ছে।

নাগরিকের ধারণা

রাষ্ট্র গঠনের একটি পূর্বশর্ত হলো জনসমষ্টি। যখন একটি রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেই জনসমষ্টি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে এর নাগরিকের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানের ওপর রাষ্ট্রের কার্যক্রমের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায় তা আমাদের জ্ঞানতে হবে।

ল্যাটিন শব্দ *Civics* থেকে *Citizen* বা নাগরিক শব্দটির উৎপত্তি হয়। সাধারণত নাগরিক শব্দটি দ্বারা নগরে বসবাসরত অধিবাসীকে বোঝায়। একসময়ে যারা শাসনকার্যে সরাসরি জড়িত থাকতেন, তাদেরকেই কেবল নাগরিক হিসেবে ধরা হতো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটল নাগরিকের সংজ্ঞার বলেছেন, ‘সে ব্যক্তিই নাগরিক যে নগর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ও শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।’ তিনি তাঁর ধারণায় অধিকাংশ জনগণকে নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাঁর মতে অধিকাংশেরই যথাযথভাবে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করার সামর্থ্য কিংবা অফুরন্ত সময় নেই। গ্রিক নগররাষ্ট্রে এ যুক্তিতে দাস এবং নারীদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো না এবং তারা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত না।

বর্তমানে নগর রাষ্ট্রের স্থলে জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ আয়তনে অনেক বড়ো, এখানে জনসংখ্যাও বেশি এবং নাগরিক সুবিধাসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকলেই ভোগ করে। কিন্তু এত বিপুল জনসমষ্টিতে সরাসরি শাসনকার্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের স্থলে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং যারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করেন এই মাপকাঠি ধরা হয়েছে। আধুনিক ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড জে’লান্সকি নাগরিকের সংজ্ঞায় বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকেই নাগরিক বলা হয়।’ অধ্যাপক গেটেল বলেন, ‘নাগরিক হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজের সেসব সদস্য, যারা উক্ত সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকেন এবং সমাজ থেকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী হন।’

সুতরাং, নাগরিকত্ব বলতে বোঝায়, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক সুবিধা ভোগ করা এবং রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য হওয়া। বৃহৎ অর্থে, নাগরিক হচ্ছেন তিনি, যিনি ঐ রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস

করেন এবং রাষ্ট্রের আইন, সংবিধান ও অন্যান্য নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নিজের কর্মের মাধ্যমে ভূমিকা রাখেন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক বণ্টনকৃত সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করে। বর্তমানে নারী-পুরুষ, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে; তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব অর্জনের শর্তাবলী বিভিন্ন রকম।

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের বিবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার দিয়ে থাকে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। নাগরিকদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ:

নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলা। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সর্বদা সজাগ এবং চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন ও সংবিধান মেনে চলা এবং আইনের প্রতি সম্মান দেখানো নাগরিকদের অন্যতম দায়িত্ব। কেউ আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বাভাবিক জীবনের ব্যাঘাত ঘটে। তাই সুষ্ঠু জীবনযাপন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হবে।

সততা ও সুবিবেচনার সাথে ভোট দেওয়া নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর ফলে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবেন। অযোগ্য ও দুর্নীতিবাজ প্রার্থীকে ভোটদানে বিরত থাকা উচিত।

কাজ

দৃশ্যগত : রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস নাগরিকদের প্রদেয় কর ও বাজিনা। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকদের যথাসময়ে কর প্রদান করে রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা নাগরিকের কর্তব্য। সরকারের গৃহীত যে কোনো কাজ জনগণের কাজ। নাগরিকদের সততা, কাজে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার ওপর সরকারের সফলতা, উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে।

প্রতিটি শিশুই রাষ্ট্রের নাগরিক। পিতামাতা তার অতিভাবক হিসেবে কাজ করেন। তাই সন্তানদের জীবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকাদান, সুস্থ সবল রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পাঠানো পিতামাতার দায়িত্ব। এতে করে সন্তান সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখবে।

প্রত্যেক নাগরিককেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। নিজস্ব সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় অর্জন ও সফলতা এবং সবসময় দেশের মঙ্গল কামনা করা নাগরিকদের কর্তব্য। জাতীয় সংগীত, জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় বীর ও মনীষীদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হবে।

প্রত্যেক নাগরিকের একে অপরকে সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, ভিন্নমত মূল্যায়ন করা ও সম্মান করার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি অর্জন করা সম্ভব। এটা প্রত্যেককেই বিশ্বাস করতে হবে যে, বৈচিত্র্যের মধ্যেই সৌন্দর্য নিহিত।

প্রত্যেক নাগরিককেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমনকি রাষ্ট্রের বেআইনি কোনো কাজের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ানো নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে কোনোক্রমেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। তাহলেই সুশাসন এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

আইনের ধারণা

সাধারণভাবে আইন বলতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত লিখিত ও অলিখিত বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে বোঝায়। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অধিকাংশ মানুষই এ নিয়ম-কানুনসমূহ মেনে চলে। সুতরাং আইন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি বা বিধিবিধান। এ অর্থে আইন মূলত দুই ধরনের- সামাজিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন। সামাজিক জীবনে যে সকল বিধিবিধান বা রীতিনীতি মানুষ মেনে চলে তা হচ্ছে সামাজিক আইন। আর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে কিংবা সমাজে সৃষ্টি বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধে সর্বজনীনভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশই রাষ্ট্রীয় আইন নামে পরিগণিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ ও আইনবিদগণ আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

টি. এইচ. গ্রীন বলেছেন, 'রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ আইন।' অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, 'আইন হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক প্রণীত হয়।' আইনের একটি উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন উল্টো উইলসন। তিনি বলেন, 'আইন হলো সমাজের সেইসকল প্রতিষ্ঠিত প্রথা ও রীতিনীতি যেগুলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং যা সরকারের অধিকার ও ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ করা হয়।'

সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং মানুষের সামাজিক কল্যাণের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টিকেই আইন বলে।

আইনের বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে আইনের যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ :

১. আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে।
২. আইন হচ্ছে সর্বজনীন, তা রাষ্ট্রের সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।
৩. আইন হচ্ছে একধরনের আদেশ বা নিষেধ, যা সকলকেই মান্য করতে হয়। যারা আইন অমান্য করে তাদের সাজা পেতে হয়।
৪. আইন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বমূলক কর্তৃপক্ষ হতে স্বীকৃত এবং আরোপিত।
৫. আইন হলো সমাজে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি।

আইনের উৎস

আইনের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ড আইনের ৬টি প্রধান উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো :

১. প্রথা ২. ধর্ম ৩. বিচার সংক্রান্ত রায় ৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ৫. ন্যায়বোধ ও ৬. আইনসভা।
১. প্রথা : প্রথা হলো আইনের সবচেয়ে প্রাচীনতম উৎস। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও অভ্যাসই হচ্ছে সামাজিক প্রথা। এ সকল সামাজিক প্রথার আবেদন এতই বেশি যে, এগুলো অমান্য করলে সংঘাত ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এসব প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। যেমন- ব্রিটেনের অধিকাংশ আইনই প্রথা থেকে এসেছে।

২. **ধর্ম** : মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ঐশ্বরিক আইন অনুসরণ করে আসছে। তাই ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি মূল্যবোধ ধর্ম চিহ্নিত করেছে বলে প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় বিধানই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামিক রাষ্ট্রের আইন প্রধানত কুরআন ও শরিয়ার ওপর নির্ভরশীল। হিন্দু আইনও মূলত হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ, যেমন- বেদ, গীতা, রামায়ণ প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগেও ধর্মীয় রীতিনীতি আইনরূপে গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি-বিধান ও রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলে।
৩. **বিচারসংক্রান্ত** : বিচারকের রায় অথবা বিচার বিভাগীয় রায়ও আইনের একটি উৎস। বিচারকালে বিচারক যদি প্রচলিত আইনের মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন তখন তিনি স্বীয় বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বিচারের রায় প্রদান করেন। এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায় এবং একসময় আইনে পরিণত হয়। তাই দেখা যায়, বিচারকের রায়ও আইনের একটি উৎস।
৪. **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা** : আইনবিদদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা তাদের আইন বিষয়ক গ্রন্থাবলিও আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। প্রখ্যাত আইনবিদদের ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন, আলোচনা ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইনের সম্পাদনা লাভ করে। ব্রিটেনের আইন ব্যবস্থায় আইনবিদ কোক, ব্ল্যাকস্টোন, আমেরিকার বেস্ট, ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রা.) প্রমুখের অনেক অভিমতই আইনের মর্যাদা লাভ করেছে।
৫. **ন্যায়বোধ** : বিচারক যখন প্রচলিত আইনের মাধ্যমে কিংবা উপযুক্ত আইনের অভাবে ন্যায়বিধান করতে ব্যর্থ হন তখন নিজস্ব সামাজিক নীতিবোধের আলোকে ন্যায় রায় প্রদান করেন। এরূপ নীতিবোধ দ্বারা প্রণীত আইন দেশের আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই ন্যায়নীতি ও ন্যায়পরায়ণতা আইনের একটি প্রকৃত উৎস।
৬. **আইনসভা** : আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভাই আইনের প্রধান উৎস। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আইনসভা বা আইন পরিষদ আছে। এ আইনসভায় দেশের জনগণের স্বার্থকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধন হয়ে থাকে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও রাষ্ট্র প্রধানের জারিকৃত প্রশাসনিক ডিক্রি, বৈদেশিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনের রেটিফিকেশনও আইন হিসেবে গৃহীত হয়।

সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। কেউ কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। সাধারণভাবে আইনের অনুশাসন দুটি ধারণা প্রকাশ করে, যথা: আইনের প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সকলের সাম্য।

আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সচরাচর সাহস করে না। বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা ও শাস্তি দেওয়া প্রভৃতি আইনের শাসনের

পরিপন্থি। আইনের প্রাধান্য নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। সমাজে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ আইন অমান্য করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সরকারও কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না।

কাছ
একক : বাংলাদেশে আইনের শাসন অপরিহার্য কেন? কারণগুলো উল্লেখ কর।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বুঝায় সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান। আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য। রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই খর্ব হয় যখন আইনের অনুশাসন থাকে না। আইনের শাসনের অভাবে নাগরিকরা হয়রানির শিকার হতে পারে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি না হলে আইনের শাসন কয়েম হয় না।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ‘রাষ্ট্র সামাজিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান’ – ব্যাখ্যা কর।
২. রাষ্ট্র গঠনের মূখ্য উপাদান কোনটি? ব্যাখ্যা কর।
৩. সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ‘যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে যতবেশি উন্নত তার ঐচ্ছিক কার্যাবলি ততবেশি বিস্তৃত।’ – উক্তিটির পক্ষে তোমার মতামত দাও।
২. বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ‘আইন হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম, যা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রণীত হয়’ – উক্তিটি কার?

ক. টি. এইচ. গ্রীন	খ. হল্যান্ড
গ. উড্রো উইলসন	ঘ. অ্যারিস্টটল
- ২। নাগরিকের দায়িত্ব হলো –

ক. রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা	খ. অধিক সংখ্যক লোককে শিল্পকারখানায় কাজে লাগানো
গ. দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা	ঘ. রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা
- ৩। আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
 - i. মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা
 - ii. সকলের অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা
 - iii. বিধিবিধান মানতে বাধ্য করা

উপরের তথ্যের আলোকে নিম্নের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

অভি ও রাফি দুই বন্ধু একদিন প্রতিবেশীর গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। বাড়িওয়ালা দুজনকে ধানায় সোপর্দ করেন। রাফির বাবা প্রভাবশালী হওয়ায় তিনি তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেন। অভির দরিদ্র বাবা-মা অনেক মিনতি করেও অভিকে ছাড়াতে পারেননি।

৪। অভির ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের যে দিকটি প্রযোজ্য হয়নি—

- i. আইনের প্রাধান্য
- ii. আইনের দৃষ্টিতে সাম্য
- iii. আইনের সর্বজনীনতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫। উক্ত দিকটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে, আইনের দৃষ্টিতে—

- i. ধনী-গরিব সকলেই সমান হবে
- ii. সকলের জন্য আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে
- iii. কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি মোবারক হোসেন শ্রমনীতি প্রণয়ন, বয়স্কভাতা ও পেনশন বৃদ্ধির জন্য আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ২টি নতুন হাসপাতাল, বিনামূল্যে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বই বিতরণ এবং বাল্যবিবাহরোধে আইন প্রণয়ন করেন।
 - ক. 'স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র' - উক্তিটি কার?
 - খ. 'নাগরিকত্ব' ধারণাটি কী? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. জনাব মোবারক হোসেন কর্তৃক শ্রমনীতি প্রণয়ন রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ, তা ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রকে কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়? উত্তরের স্বপক্ষে তোমার যুক্তি দাও।